কা য় রো ট্রি ল জি

প্যালেস অব ডিজায়ার

নাগিব মাহফুজ

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

ভূমিকা

১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর কায়রোর গামালিয়া মহল্লায় আরবি সাহিত্যে প্রথম এবং একমাত্র নোবেল পুরস্কার বিজয়ের গৌরবের অধিকারী নাগিব মাহফুজের জন্ম। পরিবারে পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ষষ্ঠ ভাই ছিলেন তার চেয়ে দশ বছরের বড়। ধর্ম তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জীবনের প্রথম দশ বছর তিনি গামালিয়ায় কাটান এবং তার প্রথমদিকের বাস্তবধর্মী উপন্যাস 'মিদাক অ্যালে', 'কায়রো ট্রিলজি', 'চিলড্রেন অব দি অ্যালে', 'দি হারাফিশ'-এ গামালিয়ার জীবন উঠে এসেছে বিস্তারিতভাবে। মিশরের সমাজকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার রচনায়। পারিবারিক জীবনও তার রচনায় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে, যা কায়রো ট্রিলজিতে আবদ আল-জাওয়াদ পরিবারের বাড়িকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ১৯১৯ সালের বিপ্লবের স্থায়ী প্রভাব ছিল নাগিব মাহফুজের ওপর, যখন তার মধ্যে প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, যার প্রভাব দেখা যায় তার রচনায়। ১৯৫২ সালের বিপ্লব তার মাঝে সম্ভবত কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং তার অনেক রচনায় তিনি এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অনেক বুদ্ধিজীবীকে জামাল আবদুল নাসের ভিন্নমত প্রকাশের অভিযোগে গ্রেফতার করলেও মাহফুজ গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হন।

নাগিব মাহফুজের লেখালেখির সূত্রপাত ঘটেছিল তিনি যখন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই, যখন তিনি গোয়েন্দাকাহিনি, ঐতিহাসিক ও রহস্য উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় তিনি আরবি সাহিত্যিক তাহা হোসেন, মুহাম্মদ হোসেন হাইকল, ইব্রাহিম আল-মাজিনির উপন্যাসের দিকে ঝোঁকেন, যাঁরা তার ছোটগল্প রচনার আদর্শ ছিলেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯৩০ সালে ভর্তি হন ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেটি বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। ১৯৩৪ সালে তিনি দর্শনে ডিগ্রি লাভ করেন এবং আব্বাস আল-আক্কাদের রচনা পাঠ করে দর্শনভিত্তিক লেখায় অনুপ্রাণিত হন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৭১ সালে ষাট বছর বয়সে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সরকারি বিভাগে কাজ করেছেন সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে। ১৯৫০ সাল থেকে তিনি ন্যাশনাল গাইডেন্স মন্ত্রীর সেক্রেটারি, ফিল্ম সেন্সরশিপ দপ্তরের পরিচালক, ফিল্ম সাপোর্ট অর্গানাইজেশনের

মহাপরিচালক, ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির উপদেষ্টা এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাহফুজ অবিবাহিত জীবন কাটান। বিয়ে করেন ৪৩ বছর বয়সে। দুটি কন্যাসন্তানের পিতা ছিলেন তিনি। জীবনে মাত্র তিনবার তিনি মিশরের বাইরে গেছেন— ইয়েমেন, যুগোশ্লাভিয়া ও যুক্তরাজ্যে।

তার প্রথম উপন্যাস 'খুফু'জ উইজডম' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এরপর তার আরও ৩৫টি উপন্যাস এবং পনেরোটি ছোটগল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় তার আত্মজীবনী। ১৯৯৪ সালে তার জীবনের ওপর হামলা হয়। হামলাকারী তার গলায় ছুরিকাঘাত করে এবং অল্পের জন্য তিনি প্রাণে রক্ষা পান। অবশিষ্ট জীবনে তার পক্ষে মাত্র দুটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হয়েছিল— 'দ্য ড্রিমস' এবং 'ড্রিমস অব ডেপারচার'। এ উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয় ২০০৪ ও ২০০৬ সালে। ১৯৪০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নাগিব মাহফুজ প্রায় ২৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তার উপন্যাস ও ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে মিশরে ত্রিশটির বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। নাগিব মাহফুজ ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ১৯৮৯ সালে তাকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল প্রদান করে এবং ১৯৯৫ সালে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে। ২০০৬ সালের ৩০ আগস্ট তিনি ইন্তেকাল করেন।

নাগিব মাহফুজের অধিকাংশ উপন্যাসের ক্ষেত্র কায়রো। তার উদ্দেশ্য ছিল কিছু গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে মিশরের সমগ্র ইতিহাসকে তুলে ধরা। কিন্তু তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আবাথ আল-আকদার' *(Mockery of the Fates) (1939),* 'রাডোপিস' (১৯৪৩) এবং 'কিফাহ তিবাহ' *(The Struggle of Thebes) (1944),* রচনার পর তিনি তার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে সাধারণ মিশরবাসীর ওপর সামাজিক পরিবর্তনের বর্তমান ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের ওপর তার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। পঞ্চাশের দশকে তার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম 'কায়রো ট্রিলজি' প্রকাশিত হয়। বাস্তবভিত্তিক এ উপন্যাস 'কায়রো ট্রিলজি', তাকে বিশ্বখ্যাতি এনে দেয় এবং তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জনের গৌরব অর্জন করেন। বিশাল এ উপন্যাসটির একই কাহিনিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 'বায়ান আল-কাসরায়েন' (প্যালেস ওয়াক-১৯৫৬), 'কসর আল শউক' (প্যালেস অব ডিজায়ার-১৯৫৭) ও 'আল-সুক্কারিয়া' (সুগার স্ট্রিট-১৯৫৭)। কায়রোর যে-এলাকায় মাহফুজ বেড়ে উঠেছিলেন– সেখানকার এক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রধান আল-সাইয়িদ আহমদ আবদ আল-জাওয়াদ এবং তার পরিবারের তিনটি প্রজন্মের কথা উঠে এসেছে উপন্যাসটিতে, যার সময়কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৫০-এর দশকে রাজা ফারুককে উৎখাত করা পর্যন্ত।

নাগিব মাহফুজ কোনো নীতির প্রচারক হিসেবে নিজেকে বিবেচিত হতে দেননি, কিন্তু তার একটি লক্ষ্য ছিল লেখক হিসেবে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন। তার সৃষ্টি সংস্কৃতি, শালীনতা ও সদাচারের শিক্ষা দেয়, বিশেষত তিনি যখন কায়রোর নিম্ন-

মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবারকে তার কাহিনিতে তুলে এনেছেন, যাদের মাঝে তিনি তার শৈশব ও যৌবন কাটিয়েছেন। তার উপন্যাস ও ছোটগল্প বাস্তবে শিল্পকর্ম, যেখানে অতি প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িক প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, মানুষের প্রশ্ন ও সমস্যা, সমাজের দার্শনিক দিক ও অস্তিত্বের সংগ্রামের বিষয় এসেছে। মিশরের ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন, মানুষের দুর্নীতি-চিন্তা ও অনিবার্য বিপর্যয় ফুটিয়ে তুলতে নাগিব মাহফুজ একজন তদন্তকারীর ভূমিকা পালন করেছেন অব্যাহতভাবে এবং এসবের মধ্যদিয়ে তিনি নিজেকেই সন্ধান করেছেন। তার উপন্যাসের পাঠকদের সাথে বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সাক্ষাৎ ঘটে, তার বর্ণনার মানুষগুলো সামনে আসে, আবার নিমেষেই হারিয়ে যায়, কিন্তু পাঠকের মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে যায়, অনেক প্রশ্ন রেখে যায় পাঠকের মনে অথবা হেঁয়ালির সৃষ্টি করে। তার উপন্যাস পাঠককে প্রায়শ ধারণা দেয় যে তিনি প্রকৃতপক্ষে মিশরের ইতিহাস রচনা করেছেন, শুধু সময় ও পরিবেশের সাথে প্রেক্ষাপট বদলে গেছে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কোথাও কোথাও অর্থ ও ব্যাখ্যা বদলে গেছে মাত্র।

কায়রো ট্রিলজি

'দি কায়রো ট্রিলজি' নাগিব মাহফুজের সেরা সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত, যাতে কায়রোর শহুরে জীবনের বিবরণ সবিস্তারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন করতে ছয় বছরের অধিক সময় লেগেছে—১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। এটি রচনা করতে তিনি জন গলসওয়ার্দির 'দি ফোর্সাইট সাগা' ও টমাস মানের 'বাডেনব্রুকস' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক আরবি সাহিত্যে 'দি কায়রো ট্রিলজি' প্রথম পারিবারিক কাহিনি। অনেকেই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেও এটির ব্যাপকতা ছাড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। ট্রিলজি তার নিজস্ব দিকনির্দেশনার অনুসন্ধান এবং ব্যক্তিগত চেতনা ও ইতিহাস তুলে ধরার প্রচেষ্টার প্রতিফলন। সামাজিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মূল্যবান দলিল ছাড়াও 'দ্য কায়রো ট্রিলজি'র সাহিত্যমান অনন্যসাধারণ।

উপন্যাসটিতে কায়রোর একটি পিতৃতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত পরিবারের নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটি মিশরীয় পরিবারকে উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখে পরিবারটির তিন প্রজন্মের উত্থান-পতনের খুঁটিনাটি বিবরণ আধুনিক আরবি সাহিত্যে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। পরিবারে পিতার অনমনীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও মায়ের ভূমিকাকেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যদিও অবদানের কোনো স্বীকৃতি নেই। মা শুধু পরিবারের জীবনের একমাত্র কেন্দ্র নন, তার সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার কাঠামোর ভেতরেই কাহিনির বর্ণনামূলক স্তরের নিচেই পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নীরব বিদ্রোহ প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়। মিশরের আধুনিক পথপরিক্রমায় এই সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটিও উপন্যাসে চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। সেদিক থেকে কায়রো ট্রিলজিতে পারিবারিক

কাহিনির পাশাপাশি জাতীয় সামাজিক অবস্থারও প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে। ট্রিলজির কাহিনিকাল দীর্ঘ, মিশরের আধুনিক ইতিহাসের চূড়ান্ত গতি নির্ণয়ের যুগকে ধারণ করেছে— প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অটোমান শাসনের অবসানের লক্ষ্যে বোমাবর্ষণ এবং ১৯১৯ সালে সূচিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত একটি পর্যায় 'প্যালেস ওয়াক'-এর উপজীব্য। 'প্যালেস অব ডিজায়ার'-এর কাহিনি শুরু হয়েছে পাঁচ বছর পর ১৯২৪ সালে জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ পার্টির নেতা সা'দ জগলুল পাশার সাথে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আলোচনার মধ্যদিয়ে এবং শেষ হয়েছে ১৯২৭ সালে তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। 'সুগার স্ট্রিট'-এর কাহিনির সূত্রপাত ১৯৩৫ সালে ওয়াফদ পার্টির সম্মেলনে সা'দ জগলুল পাশার উত্তরাধিকারী মোস্তফা আল-নাহাসের বক্তৃতা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে ১৯৪৪ সালে রাজনৈতিক কর্মীদের গণ-গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে। কিন্তু উপন্যাসে এই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সাময়িক প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে, মূল বিবরণের অন্তর্নিহিত স্মৃতি হিসেবে, যা উপস্থাপনার সাথে অবিচ্ছেদ্য। 'কায়রো ট্রিলজি'তে আমরা দেখতে পাই যে সময় ও দেশের রাজনীতির সাথে একটি পরিবারের জীবন কীভাবে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যায় এবং পরিস্থিতির সাথে বিভিন্ন সময়ে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। উপন্যাসটির প্রতিটি খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে একটি মৃত্যু ও একটি জন্ম দিয়ে এবং শেষ খণ্ড 'সুগার স্ট্রিটে' মৃত্যু ও জন্ম ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর মতো। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে আমিনার মৃত্যু এবং তার দুই নাতি আহমদ ও আবদ আল-মু'নিমের গ্রেফতারের মধ্যদিয়ে। একজন কমিউনিস্ট, অপরজন মুসলিম ব্রাদার। সুগার স্ট্রিটের একই বাড়ি থেকে দুই বিপরীতমুখী ও প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের ধারকের উদ্ভব এবং শেষ পর্যন্ত তারা উভয়ে কারাগারে একই প্রকোষ্ঠে বন্দি। কিন্তু ট্রিলজির শেষ খণ্ডে জন্ম বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ নবজাত একজন ইসলামপন্থির পুত্র, যা আরব জগতের বর্তমান বাস্তবতার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউ ইয়র্ক, নভেম্বর, ২০১৬

১

আল-সাইয়িদ আহমদ আবদ আল-জাওয়াদ দরজা বন্ধ করে তারার অস্বচ্ছ আলোতে বাড়ির আঙিনা অতিক্রম করলেন। তিনি অলস পা ফেলছেন এবং যখনই ক্লান্ত হয়ে তার ছড়ির ওপর ভর করছেন, ছড়ি ধূলিময় মাটিতে ডুবে যাচ্ছে। তিনি প্রচণ্ড গরম অনুভব করছেন এবং তার মুখ, মাথা, গলা ধোয়ার জন্য ঠান্ডা পানির আকাঙ্ক্ষা করছেন। যদি সম্ভব হয় তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও জুলাই মাসের উত্তাপ এবং তার পেট ও মাথায় যে আগুন জ্বলছে তা থেকে পালাতে চান। ঠান্ডা পানির কল্পনায় তিনি উৎফুল্ল হয়ে হাসলেন। সিঁড়ির দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই তিনি লক্ষ করলেন ওপর থেকে একটি মৃদু আলো আসছে। আলোটি দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যে হাত প্রদীপ ধরে রেখেছে সেই হাতের নড়াচড়া বুঝা যাচ্ছে। এক হাতে রেলিং ধরে এবং আরেক হাত ছড়িতে রেখে তিনি সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করছেন। ছড়ির মাথা এক একটি ধাপে রাখার শব্দ এক ধরনের তালের সৃষ্টি করে, যা তাকে তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মতোই পরিচিত করে তুলেছে। সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে প্রদীপ হাতে আমিনাকে দেখা যাচ্ছে। তার কাছে পৌঁছে তিনি দম নেওয়ার জন্য থামলেন। তার বুক ওঠানামা করছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে তিনি আমিনাকে শুভেচ্ছা জানালেন, "শুভ সন্ধ্যা।"

তার দিকে এগিয়ে আমিনা মৃদু কণ্ঠে সাড়া দিলেন, "শুভ সন্ধ্যা, জনাব।"

রুমে প্রবেশ করেই তিনি ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন। ছড়ি রেখে, মাথা থেকে ফেজটুপি খুলে পেছন দিকে হেলান দিয়ে পা সামনে ছড়িয়ে দিলেন। তার আলখেল্লার দুপাশ ছড়িয়ে পড়েছে এবং নিচে মোজায় এক প্রান্ত গুঁজে রাখা তার দীর্ঘ অন্তর্বাস দেখা যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে রুমাল দিয়ে কপাল, গাল ও গলা মুছলেন।

টেবিলের ওপর বাতি রেখে আমিনা অপেক্ষা করছেন যে আল-সাইয়িদ আহমদ উঠে দাঁড়ালে তিনি জামাকাপড় খুলতে সাহায্য করবেন। তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে তার দিকে তাকালেন। মনে হলো যদি তার সাহসে কুলাত

তাহলে তিনি তাকে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাড়ির বাইরে না কাটাতে বলতেন। এখন স্বাস্থ্যগত কারণে অতিরিক্ত কোনোকিছুই তার সহ্য হবে না। কিন্তু তিনি জানেন না যে কী করে তার বিষাদপূর্ণ ভাবনাগুলো প্রকাশ করবেন।

চোখ খোলার আগে কয়েক মিনিট অতিবাহিত হলো। তিনি দীর্ঘ জামার পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বের করে এবং হীরার আংটি খুলে ফেজটুপিতে রাখলেন। আমিনার সাহায্যে আলখেল্লা ও জামা খোলার জন্য যখন দাঁড়ালেন তার দেহ দীর্ঘ, প্রশস্ত এবং বরাবরের মতো পরিপূর্ণ মনে হলো, যদিও তার মাথার সামনের দিকের চুলে পাক ধরেছে। যখন তিনি বাড়িতে ব্যবহারের সাদা জামা পরলেন, তখন হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তার মনে পড়ল, তাদের সান্ধ্য আসরে আলী আবদ আল-রহিম কীভাবে বমি করে নিজের দুর্বলতার জন্য ক্ষমা চেয়ে এটিকে তার পেট খারাপের অজুহাত হিসেবে দেখালেন। তারা তাকে আসর থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যে তাদের বন্ধুটির পক্ষে মদ্যপান সহ্য হবে না। কারণ শুধু বিশেষ ধরনের মানুষের পক্ষেই তার জীবনের শেষ পর্যন্ত মদ্যপান অব্যাহত রাখা সম্ভব। বন্ধুদের এ ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণের জন্য আবদ আল-রহিম কীভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তাও তার মনে পড়ল। কী বিস্ময়ের ব্যাপার যে কিছু লোক এমন তুচ্ছ ব্যাপারকে কতটা গুরুত্ব দেয়। কিন্তু এটি যদি গুরুত্বপূর্ণ না হবে তাহলে তিনি কীভাবে তার মদ্যপানের মুহূর্তে উচ্ছ্বাসের সাথে বলেন যে শরীরের ওপর কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই তিনি শুঁড়িখানার পুরো মদ পান করতে পারবেন?

তিনি আবার বসে পা তুললেন যাতে তার স্ত্রী জুতা ও মোজা খুলে নিতে পারেন। আমিনা কিছুসময়ের জন্য রুমের বাইরে গিয়ে একটি গামলা ও পানির সোরাহি আনলেন। তিনি পানি ঢালতে শুরু করলে আল-সাইয়িদ দুহাতে পানি নিয়ে মুখ, গলা ধুয়ে মুখের ভেতর পানি নিয়ে গড়গড়া করলেন। এরপর দুই পা ভাঁজ করে বসলেন। আঙিনার দিকের জানালা ও বারান্দা থেকে আসা মৃদু বাতাস তার ভালো লাগছে।

"এ বছরের গ্রীষ্ম কী ভয়াবহ!"

বিছানার নিচ থেকে পিঁড়ির মতো একটি আসন বের করে আমিনা পা আড়াআড়ি করে বসে উত্তর দিলেন, "মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি সদয় হোন।" দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তিনি কথা বলে চলেছেন, "সমগ্র দুনিয়াটাই যেন আগুনের কুণ্ডে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে রান্নাঘর। ছাদের ওপর ছাউনিটাই একমাত্র জায়গা, যেখানে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আপনি দম নিতে পারেন।"

বরাবর তিনি সেখানেই বসেন, কিন্তু সময় তার মাঝে পরিবর্তন এনেছে। তিনি আরও শুকিয়ে গেছেন এবং তার মুখটা লম্বাটে হয়ে গেছে বলে মনে হয়, বিশেষ করে তার গালের টোল এখন গর্তের মতো হয়ে গেছে। তার ওড়নার ফাঁক দিয়ে যে চুলগুলো বাইরে বের হয়ে থাকে সেগুলোতে এখন পাক ধরেছে এবং এর ফলে তাকে তার বয়সের চেয়েও বেশি বয়সের মনে হয়। তার গালে যে তিলটি তার সৌন্দর্যকে আরও বিকশিত করত সেটি এখন আকৃতিতে বড় হয়েছে। প্রচলিত আনুগত্যের দৃষ্টি ছাড়াও তার চোখে বিষাদপূর্ণ শূন্যতা লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের প্রভাব তার ওপর যেন একটু বেশিই পড়েছে, যদিও তিনি পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন তার দুঃখের প্রকাশ হিসেবে। এরপর তিনি উদ্বেগের সাথে ভাবতে থাকেন যে, জীবনের শেষ পর্যন্ত আসলেই তার সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন আছে কি না। হ্যাঁ, পরিবারের অন্যান্যের জন্য তার স্বাস্থ্য ভালো থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু কী করে সবকিছু আবার আগের মতো হবে? বৃদ্ধা না হলেও তার বয়স বেড়েছে এবং এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। এখনো তার বয়সের পার্থক্য তেমন ধরা যায় না।

রাতের পর রাত তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঠের গ্রিলের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি দেখতে পান যে রাস্তাগুলোর কোনো পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু তার ভেতরে পরিবর্তন এসেছে হামা দিয়ে। কফিহাউজের ওয়েটারের কণ্ঠ তাদের নীরব রুমে প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি হেসে আল সাইয়িদ আহমদের দিকে তাকান। এ রাস্তাটি তার অত্যন্ত প্রিয়, সারারাত জেগে থাকে এবং তার হৃদয়কে সঙ্গ দেয়। রাস্তাটি তার বন্ধু, কিন্তু তার হৃদয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যে হৃদয় গ্রিলের আড়াল থেকে তাকে ভালোবাসে। রাস্তার বৈশিষ্ট্য তার মনকে পূর্ণ করে এবং রাস্তাটির সান্ধ্য বাসিন্দাদের প্রাণবন্ত কণ্ঠ তার কানে বাজে, ঠিক কফিহাউজের ওয়েটারের মতো, যার কণ্ঠ কখনো থামে না। মোটা, খসখসে কণ্ঠে এক ব্যক্তি দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকেন ক্লান্তিহীনভাবে এবং বিরক্ত না হয়ে। দুর্বল কণ্ঠের লোকটি তাসের কার্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে। হুপিং কাশিতে আক্রান্ত ছোট্ট মেয়ে হানিয়ার পিতা, যিনি রাতের পর রাত মেয়েটি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, "একমাত্র আমাদের প্রভুই পারেন ওকে সারিয়ে তুলতে।" বারান্দাটি যেন কফিহাউজের একটি বিশেষ স্থান। রাস্তাটির স্মৃতি তার কল্পনার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। আল-সাইয়িদের মাথার ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, মাথাটি সোফার পেছন দিকে হেলান দেওয়া। পরিচিত চেহারাগুলো যখন শেষ হয় তখন তিনি মনোযোগ দেন তার স্বামীর দিকে। তিনি লক্ষ করেন যে তার মুখের প্রান্ত উজ্জ্বল লাল। বাড়িতে ফিরলে তিনি

তাকে এভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন। হঠাৎ তিনি অস্বস্তিতে পড়েন এবং উৎকণ্ঠিতভাবে জানতে চান, "জনাব, আপনি কি ভালো আছেন?"

তিনি মাথা সোজা করে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর।" এরপর আবার বলেন, "কিন্তু আবহাওয়া ভয়াবহ।"

গ্রীষ্মের সেরা পানীয় কিশমিশের স্বচ্ছ শরবত। কথাটি আল-সাইয়িদকে তার বন্ধুরা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ শরবত তার সহ্য হয় না। তার জন্য উত্তম পানীয় হচ্ছে হুইস্কি—অন্য কোনোকিছু নয়। এই গরমের মধ্যেও তাকে প্রতিরাতে প্রমোদ বিহারে যেতে হয়, কিন্তু এবার আসলেই গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা ভয়াবহ। ওই সন্ধ্যায় তিনি খুব হেসেছেন। গলার শিরা ফুলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি হেসেছেন। কিন্তু কী নিয়ে ছিল তার এই হাসি? তিনি স্মরণ করতে পারেন না। কোনোকিছুর সাথে তিনি এটি মিলাতে পারছেন না। আসরের পরিবেশ এতটাই সহানুভূতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে আলো জ্বালানোর জন্য বিদ্যুতের স্পর্শের মতো কোনোকিছুর প্রয়োজন ছিল। ইব্রাহিম আল-ফার যে মুহূর্তে বলেন যে, "সা'দ জগলুল পাশা আজ জাহাজযোগে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন।" তার কথা শুনে তারা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন, কারণ তাদের মনে হয়েছে যে মাদকতার ফলে কথাটি তার মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে।

তারা দ্রুত মন্তব্য করেন, "তিনি তার সুস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত রাখবেন এবং এরপর লন্ডনের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার জন্য সেখানে যাত্রা শুরু করবেন অথবা তিনি স্বাধীনতার চুক্তির জন্য র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে অভ্যর্থনা জানাবেন এবং মিশরের স্বাধীনতা নিয়ে ফিরে আসবেন।" তারা সম্ভাব্য আলোচনা নিয়ে কথা বলতে থাকেন এবং যার যেমন খুশি তেমন মন্তব্য করতে থাকেন।

যদিও তার বন্ধুমহল অত্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু এ ধরনের আলোচনা তার তিন বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে : মুহাম্মদ ইফফাত, আলী আবদ আল-রহিম এবং ইব্রাহিম আল-ফার। তাদেরকে ছেড়ে তিনি কি পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেন? তাকে দেখার সাথে সাথে যথার্থ আনন্দে যেভাবে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তা দেখে তিনি যত সুখী হন এর চেয়ে আর কোনোকিছু তাকে এত আনন্দিত করতে পারে না। তার স্বপ্নালু চোখ মিলিত হয় আমিনার সপ্রশ্ন দৃষ্টির সাথে। যেন অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনোকিছু তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন এমনভাবে বললেন, "আগামীকাল।"

হাসিমুখে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার পক্ষে কী করে ভুলে যাওয়া সম্ভব?"

আল-সাইয়িদ আহমদ তার অহংকার গোপন করার চেষ্টা না করে মন্তব্য করলেন, "এ বছর ব্যাচেলর ডিগ্রির ফলাফল খুব খারাপ হয়েছে বলে কথা হচ্ছে।"

আমিনা স্বামীর অহংকারের সাথে নিজেকে অংশীদার করতে আরেকবার হেসে বললেন, "আমাদের প্রভু তার চেষ্টাকে সফল করুন এবং তার ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ যাতে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন।"

"তুমি কি আজ সুগার স্ট্রিটে গিয়েছিলে?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

"জি," আমিনা উত্তর দিলেন, "এবং সবাইকে দাওয়াত দিয়ে এসেছি। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ছাড়া তারা সবাই আসবে। তিনি খুব ক্লান্ত বলে জানিয়েছেন। তার দুই ছেলে তার পক্ষ থেকে কামালকে অভিনন্দন জানাবে।"

নিজের আলখেল্লার দিকে ইঙ্গিত করে আল-সাইয়িদ আহমদ বললেন, "শেখ মুতাওয়াল্লি আবদ আল-সামাদ আজ খাদিজা ও আয়িশার সন্তানদের জন্য তাবিজ দিয়ে গেছেন। আমার জন্য তার দোয়া ছিল, 'আল্লাহ চাইলে আমি আপনার নাতির সন্তানদের জন্য তাবিজ বানিয়ে দেবো'।"

মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি হাসলেন এবং বললেন, "আল্লাহর পক্ষে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। শেখ মুতাওয়াল্লির বয়স আশি বছরের অধিক হওয়া সত্ত্বেও এখনো তিনি লোহার মতো শক্ত।"

"আমাদের প্রভু আপনাকে সুস্বাস্থ্য ও শক্তি দান করুন।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আঙুলে গণনা করার পর বললেন, "আমার পিতা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তার বয়স শেখ মুতাওয়াল্লির চেয়ে বেশি হতো।"

"যারা এ জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ তাদের সকলকে ক্ষমা করুন।"

মৃত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ ওঠায় কিছুসময় পর্যন্ত নীরবতা বিরাজ করল, যেন উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্মরণ করছেন। আল-সাইয়িদ আহমদ বললেন, "জয়নাবের বিয়ে ঠিক হয়েছে!"

আমিনার চোখ বড় হলো। মাথা তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, মুহাম্মদ ইফফাত আজ রাতেই আমাকে বললেন।"

"কার সাথে ওর বিয়ে হচ্ছে?"

"মুহাম্মদ হাসান নামে এক সরকারি অফিসারের সাথে। লোকটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রেকর্ড অফিসের প্রধান।"

হতাশার সুরে আমিনা বললেন, "মনে হচ্ছে, লোকটির বেশ বয়স হয়েছে।"

"না, তা হয়নি," আল-সাইয়িদ আহমদ আপত্তি করলেন। "ত্রিশের ওপর তার বয়স। পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বছর, বেশি হলে চল্লিশ বছর হতে পারে।" তিনি একটু পরিহাসের সুরে বললেন, "জয়নাব তরুণদের সাথে তার ভাগ্য স্থির করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আমি বলতে চাইছি যে, মেরুদণ্ড ছাড়া তরুণ। পরিপক্ব এই লোকটির সাথে সে ভাগ্যের পরীক্ষা করে দেখুক।"

আমিনা বিষণ্নভাবে বললেন, "স্বামী হিসেবে ইয়াসিন তার জন্য উপযুক্ত ছিল।"

আল-সাইয়িদ আহমদ তার অভিমতের সাথে মতৈক্য প্রকাশ করলেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুহাম্মদ ইফফাতকে এ বিষয়টি বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। ব্যর্থতা গোপন রাখার জন্য কাউকে বলেননি যে তিনি মুহাম্মদ ইফফাতের সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন। বিরক্তির সাথে তিনি বললেন, "জয়নাবের পিতা ইয়াসিনকে আর বিশ্বাস করে না এবং সত্য হচ্ছে সে আসলে বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেজন্য বিষয়টি নিয়ে আমি আর পীড়াপীড়ি করিনি। আমি আমাদের বন্ধুত্বকে এক্ষেত্রে কাজে লাগাইনি এবং তার পিতাকে এমন কিছু গ্রহণ করতে দিয়েছি যার পরিণতি খারাপ হতে পারে।"

আমিনা সহানুভূতির কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন, "যৌবনের একটি ভুলকে মার্জনা করা যেতে পারে।"

তার স্বামী অনুভব করলেন ব্যাপারটি নিয়ে তিনি যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার কিছুটা স্বীকার করা উচিত। তিনি মন্তব্য করলেন, "আমি ইয়াসিনের অধিকার অস্বীকার করি না, কিন্তু ওর ব্যাপারটি নিয়ে অগ্রসর হতে আমি উৎসাহ পাইনি। মুহাম্মদ ইফফাত আমাকে বলেছেন যে, "আমার অস্বীকৃতির প্রথম কারণ এতে আমাদের বন্ধুত্ব বিনষ্ট হতে পারে বলে আমি উৎকণ্ঠিত।" তিনি আরও বলেছেন, "আপনি যদি আমাকে কোনো অনুরোধ করেন তাহলে আমার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হবে না। আপনার অনুরোধের চেয়েও আমাদের বন্ধুত্ব আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমি এ নিয়ে কথা বলা বন্ধ রেখেছিলাম।"

মুহাম্মদ ইফফাত আসলেই কথাটি বলেছেন, কিন্তু তা শুধু আল-সাইয়িদ আহমদের পীড়াপীড়ির কারণে। তার সাথে বন্ধুত্বের দৃঢ়তা ও তার সামাজিক অবস্থানের কারণে আল-সাইয়িদ আহমদ আন্তরিকভাবেই চেয়েছেন মুহাম্মদ ইফফাতের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখতে। কিন্তু দুজনের সন্তানের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক দুঃখজনকভাবে তালাকে পরিণতি লাভ করেছে। যদিও তিনি আশা করেন না যে ইয়াসিনের জন্য জয়নাবের চেয়ে ভালো স্ত্রী পাবেন, তা সত্ত্বেও তালাকের বিপর্যয় ও পুনরায় বিয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন। বিশেষ করে তার বন্ধু যখন তাকে খোলামেলা ইয়াসিনের একান্ত জীবনের

অন্তত কিছুটা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার বিষয় উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইফফাত এমন মন্তব্য করতেও ছাড়েননি যে, "আমাকে একথা বলবেন না যে, আমরাও তো ইয়াসিনের মতোই। আমরা নানা বিচারে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আমার কন্যা জয়নাবের স্বামীকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদার হতে হবে। এমনকি তার মায়ের স্বামীর চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন।"

আমিনা জানতে চাইলেন, "ইয়াসিন কি জানে যে কী ঘটেছে?"

"সে কাল বা পরশু জানতে পারবে। তোমার কি মনে হয় যে এতে ওর মন খারাপ হবে? বিয়ের মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার মতো লোক নয় সে।"

আমি দুঃখের সাথে মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলাম, "রিদওয়ানের ব্যাপারে কী হবে?"

আল-সাইয়িদ আহমদ ভুরু ওপরে তুলে উত্তর দিলেন, "সে তার নানার সাথে থাকবে অথবা মায়ের সাথে বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পারলে মায়ের সাথে যাবে। ছেলেটিকে যারা বিব্রত করেছে, আল্লাহ তাদেরকে একইভাবে বিব্রত করুন।"

"হায় আল্লাহ! বেচারি, তার মা এক জায়গায় আর বাবা আরেক জায়গায়, জয়নাব কি আসলেই ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে?"

তার স্বামী দৃশ্যত হতাশার সাথে উত্তর দিলেন, "প্রয়োজনের নিজস্ব আইন আছে।" একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, "সে কখন তার পিতার কাছে আসার উপযুক্ত বয়সে পৌঁছবে? তোমার কি মনে আছে?"

আমিনা একটু ভেবে বললেন, "সে তো আয়িশার মেয়ে নাঈমার চেয়েও কিছু ছোট এবং খাদিজার ছেলে আবদ আল-মুনিমের চেয়ে একটু বড়। অতএব, ওর বয়স অন্তত পাঁচ বছর হতে হবে এবং ওর বাবা দুই বছরের মধ্যে ওকে নিজের হেফাজতে নেওয়ার দাবি জানাতে পারবে। সেটিই কি সঠিক হবে না?"

হাই তুলে আল-সাইয়িদ আহমদ উত্তর দিলেন, "আমরা দেখব, কখন সময় আসে।" এরপর তিনি বললেন, "আগেও সে বিয়ে করেছিল, আমি জয়নাবের নতুন স্বামীর কথা বলছি।"

"তার কি কোনো সন্তান আছে?"

"না, তার প্রথম স্ত্রীর কোনো সন্তান হয়নি।"

"সম্ভবত মুহাম্মদ ইফফাত এ কারণেই তাকে জয়নাবের জন্য পছন্দ করেছেন।"

আল-সাইয়িদ আহমদ একটু রেগে বললেন, "তার পদমর্যাদার দিকটি ভুলে যেয়ো না!"

আমিনা প্রতিবাদ করলেন, "এটি যদি শুধু সামাজিক মর্যাদার বিষয় হতো, আপনার মর্যাদার কারণেই আপনার ছেলের সাথে তুলনা করার মতো আর কেউ ছিল না।"

তিনি মনে মনে অপমানিত বোধ করে মুহাম্মদ ইফফাতের জন্য তার ভালোবাসা সত্ত্বেও লোকটিকে অভিশাপ দিলেন। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, "একটি কথা ভুলে যেয়ো না যে, আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য যদি তার আকাঙ্ক্ষা না থাকত তাহলে তিনি আমার মর্যাদা রক্ষার অনুরোধে সাড়া দিতে দ্বিধা করতেন না।"

আমিনা তার এই অনুভূতিতে সাড়া দিলেন, "অবশ্যই, এটিই তো খুব স্বাভাবিক জনাব। আপনাদের আজীবনের বন্ধুত্ব এবং এর মাঝে তুচ্ছ কিছুকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না।"

আবার হাই তুলে তিনি আপন মনে বললেন, "বাতি নিয়ে যাও।"

তার আদেশ প্রতিপালনের জন্য আমিনা উঠলেন। সোফা থেকে ওঠার আগে তিনি মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। এরপর শরীর ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিছানার দিকে এগুলেন। এখন তিনি ভালো বোধ করছেন। ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়া কত সুখকর। তার মাথার শিরাগুলো লাফাচ্ছে। প্রায়ই তিনি এক ধরনের মাথাব্যথা অনুভব করেন। যেকোনো অবস্থায় তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতে ভোলেন না। কিন্তু পুরোপুরি সহজ-স্বচ্ছন্দ বোধ করা অতীতের ব্যাপার।

"আমরা যখন আমাদের মাঝে থাকি," আল-সাইয়িদের মনে ভাবনার উদয় হয়, "তখন মনে হয়, আমরা কিছু হারাচ্ছি, যা আর কখনো ফিরে পাব না। অতীত কল্পনায় ফিরে আসে বিবর্ণ স্মৃতি হিসেবে। ছোট্ট জানালা দিয়ে আসা ফিকে আলোর মতো।"

যেকোনো অবস্থায় তার উচিত আল্লাহর প্রশংসা করা। তিনি এমনভাবে জীবনকে উপভোগ করবেন, যাতে অন্যেরা ঈর্ষান্বিত হয়। সবচেয়ে উত্তম হবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে তিনি তার বন্ধুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন অথবা করবেন না। অথবা তিনি কি আগামীকালের সমস্যা ফেলে রাখবেন?

ইয়াসিন শুধু আগামীকালের জন্য একটি সমস্যা নয়, সে গতকালের জন্য সমস্যা ছিল এবং আজকের জন্যও সমস্যা। সে এখন আর শিশু নয়। তার বয়স আটাশ বছর। তার জন্য আরেকটি স্ত্রী পাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু "আল্লাহ মানুষকে পরিবর্তন করেন না, যদি তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন না করে।" (আল-কুরআন ১৩ :১১) কখন আল্লাহ পথপ্রদর্শন করবেন এবং পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করবেন, যার আলোতে চোখ ঝলসে যাবে? তখন তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে চিৎকার করে বলবেন, "সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।"

কিন্তু মুহাম্মদ ইফফাত কী বলেছেন? ইয়াসিন এজবেকিয়ার বিনোদন পল্লিতে গেছে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত চষে বেড়িয়েছে ... এজবেকিয়া ছিল আরেক ধরনের জায়গা, যখন তিনি স্বয়ং সেখানে গেছেন এবং দাবড়ে বেড়িয়েছেন। কখনো কখনো সেখানে ফিরে যাওয়ার কল্পনা তার মধ্যে কাঁপুনির সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তার কিছু স্মৃতি এখনো অমলিন। আল্লাহর প্রশংসা করতে হয় যে, তিনি সেখানে যাওয়ার আগেই ইয়াসিনের গোপনীয়তা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তা না হলে তার বিব্রত দশা দেখে শয়তান তার হৃদয়ের গহিন থেকে বিদ্রুপের হাসি হাসত।

"পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পথ ছেড়ে দাও," তিনি নিজেকে বললেন। "ওরা বড় হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ানরা একবার সেখানে যেতে তোমার পথ আটকে দিয়েছে। এখন তোমার পুত্র তোমার পথরোধ করছে।"

২

রান্নাঘরে আটার গোলা বানানোর শব্দ এবং একটি মোরগের ডাকে সকালের নীরবতা ভঙ্গ হলো। উম্মে হানাফির মোটা শরীর আটা গোলানোর গামলার ওপর ঝুঁকে আছে। চুলার ওপরে রাখা একটি কুপির আলোতে তার মুখ ভরাট দেখাচ্ছে। বয়স তার চুলে কোনো প্রভাব ফেলেনি। তার নাদুসনুদুস শরীরের ক্ষেত্রেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু তার চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে, মুখ সদা বিষণ্ন থাকে এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো যেন আরও রুক্ষ হয়েছে। তার ডানদিকে একটি চেয়ারে আমিনা বসেছেন, যিনি রুটি বানানোর পিঁড়িতে আটা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, যাতে রুটি বানানোর সময় লেগে না যায়। উম্মে হানাফি আটার গোলা বানানোর কাজ শেষ করা পর্যন্ত দুজন নীরবে কাজ করছিলেন। এরপর গামলা থেকে হাত তুলে কপালের ঘাম মুছে হাতের মুঠি ওপরে তুললেন। আটামাখা হাত দেখে সাদা রঙের বক্সিং গ্লাভসের মতো মনে হচ্ছিল। তিনি আমিনাকে বললেন, "আজকের দিনটি আপনার জন্য কঠিন দিন হলেও তা হবে অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ। আল্লাহ আমাদেরকে এমন অনেক সুখী দিন মঞ্জুর করুন।"

কাজ থেকে মাথা না তুলে আমিনা মৃদু কণ্ঠে সাড়া দিলেন, "আমরা যে খাবারগুলো তৈরি করব তা যাতে সুস্বাদু হয় আমাদেরকে তা নিশ্চিত করতে হবে।"

উম্মে হানাফি হেসে থুতনি নেড়ে গৃহকর্ত্রীর কথায় একমত হয়ে বললেন, "আপনার দক্ষতা সেদিকে খেয়াল রাখবে।" তিনি আরেকবার গামলায় হাত দিলেন আটার গোলা রুটি বানানোর উপযুক্ত হয়েছে কি না তা পরখ করতে।

"আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি যদি আল-হুসাইন মসজিদের আশপাশে দুস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করতে পারতাম।"

উম্মে হানাফি ভদ্রভাবে তার কর্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলেন, "যারা আসবেন তাদের একজনও বহিরাগত হবেন না।"

আমিনা একটু বিচলিতভাবে বললেন, "কিন্তু একটি ভোজ অনুষ্ঠানে অনেক লোক আসবে এবং হইচই হবে। জামিল আল হামজাওয়ির ছেলে ফুয়াদও ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেছে। এ ব্যাপারে কেউ কিছু দেখেনি বা শোনেনি।"

কিন্তু উম্মে হানাফি তার ভর্ৎসনা অব্যাহত রেখেছেন, "এটি আমাদের আপনজনদের সাথে একত্রিত হওয়ার একটি সুযোগ।"

আনন্দ কী করে অতীতের স্মরণ ছাড়া হতে পারে? তিনি সাবেক সময়ে ফিরে যান এবং স্মরণ করেন কামাল যখন তার স্কুল সার্টিফিকেট লাভ করেছে, একই সময়ে ফাহমি তার আইনের ডিগ্রি হাসিল করেছে। ওই উৎসব আর কখনো ফিরে আসবে না এবং তার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা কখনো সম্মান লাভ করবে না। উনিশ, বিশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ ... যখন ফাহমির তরুণ জীবনের মুখ্য সময় হতে পারত, তা দেখার ভাগ্য আর আমিনার হবে না। এর পরিবর্তে মাটি তাকে আলিঙ্গন করেছে। কী হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা!

"আয়িশা বাকলাভা দেখে খুব খুশি হবে। এটি তাকে পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেবে।"

আয়িশা আনন্দিত হলে তার মা আমিনাও আনন্দিত হবেন, যিনি রাতের পর দিবসের সূচনা হতে দেখেছেন, পরিতৃপ্তিসহকারে আহার গ্রহণ ও ক্ষুধা প্রত্যক্ষ করেছেন, জেগে থাকা ও নিদ্রার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যেন কোনোকিছুরই পরিবর্তন ঘটেনি।

"সে মারা গেলে তুমি একটি দিনও বেঁচে থাকতে পারবে না বলে যে দাবি করেছিলে, তা এখন ভুলে যাও," আমিনা ভাবলেন। "তুমি তার কবরের শপথ নিয়ে বেঁচে আছ। যখন একটি হৃদয় উলট-পালট হয়ে যায়, তার মানে এই যে পৃথিবীও উলট-পালট হয়ে যাবে। আল-সাইয়িদ আহমদকে দেখলে মনে হয়, ঘটনাটি তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না কবর জিয়ারত করতে যাওয়ার সময় হয়। তুমি আমার দৃষ্টি ও আত্মা জুড়ে ছিলে, পুত্র। এখন তারা শুধু ছুটির দিনে তোমাকে মনে করে। কী হয়েছে তাদের? তোমার জন্য একমাত্র খাদিজা ছাড়া প্রত্যেকে যার যার কাজে ব্যস্ত। তুমি তোমার